অন্নপূর্নার পদতলে

মণিকা পালিত

৭ এপ্রিল ৮৯ বিকেল ৩টে। আমরা বসে আছি সমুদ্র সমতল থেকে ১৯৫০ মিটার উঁচুতে নেপালের এক প্রত্যন্ত গ্রাম ছমঙের ক্যাপ্টেন্স লজে। আমরা মানে আমি, কৃষ্ণা, মঞ্জু, আর ক্যাপ্টেনস্ লজেই সরাইখানার দিকে খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে উঠে আসতে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ফেরত পদযাত্রীর দল। লোকগুলো একে একে উঠছে আর আমের প্রত্যেককে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করছে Bad Knee? একুশ বছর বয়সী স্বাস্থ্যবান সুপুষ যুবা আমের উস্রায়েলের ছেলে। বাধ্যতামূলক মিলিটারি সার্ভিস শেষ করে জমানো টাকা সম্বল করে বেরিয়ে পড়েছে পর্যটনে। নেপাল হিমালয়ের টানে পৌঁছে গিয়েছিল অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্পে। খোঁড়া হয়ে ফিরেছে। বিশ্রাম নিচ্ছে ক্যাপ্টেনস্ লজে। হাঁটুর মালাই চাকির অবস্থা খারাপ। ফেরৎ যাত্রীদের মধ্যে সমব্যথী খোঁজের আশায় তাই আমেরের এই সপ্রশ্ন কৌতূহল। ক্লান্ত যাত্রীরা ক্লিষ্ট হেসে মাথা নাড়ে আর আমের মুখ চোখের এক কণ ভঙ্গী করে। ভাবখানা যাঃ এবারও মিলল না। আমরা হাসতে থাকি। আমের বলে হাসছ-- হাসো। তবে তোমাদের পা আস্ত থাকছে না। মজার ছেলে আমের। দাণ নকল করতে পারে। রেল স্টেশনের চা-ওয়ালাদের ডাক নকল করছিল খাবার টেবিলে বসে। প্রথম রাতে তারা বেশ পরিষ্কার উচচারণে হেঁকে যায় চা-য় গ্রাম। মাঝরাতের দিকে সেটা হয়ে যা শুধু চা-য়। আরও রাতে তন্দ্রাচছন্ন চা ওয়ালা ক্লান্ত একটানা সুরে চেঁচিয়ে যায় অ্যায় - অ্যায়। ছমঙের ওপর তখন রাত নেমেছে। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বাইরে ঝিঁ ঝিঁ-র আওয়াজ। দূর থেকে ভেসে আসছে ছমঙ খোলার পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে চলার মৃদু গর্জন। কাঠের ঘরের ভেতরে মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় খাবার টেবিল ঘিরে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে আছি আমরা চারজন। তার মধ্যে আমেরের মোটা গলায় ঐ অ্যায় সুর মনে পড়িয়ে দিচ্ছে রেলস্টেশনের ওয়েটিং মের কথা।

অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাবার ইচ্ছের পোকাটা মাথায় ঢুকিয়েছিলেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা আর আমাদের মুক্তিনাথ যাবার পথে মালবাহক - পথপ্রদর্শক সঙ্গী চন্দ্র। মুক্তিনাথ যাবার পথে অন্নপূর্ণা বহুদূর পর্যন্ত বরফের ঘোমটা মাথায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। চন্দ্র বার বারই বলত অন্নপূর্ণা বেশ ক্যাম্পের কথা। তার লিটিল লিটিল আপ, লিটিললিটিল ডাউন এর ভাষায়। অন্নপূর্ণার দিকে তাকিয়ে আমার সঙ্গী কৃষ্ণা বলেছিল আসছে বছর তোমার বাড়ি নিশ্চয় যাব। ৮৯ এর বছর পড়তেই তোড় জোর শু হয়ে গেল। তিনজন যে যার মত করে তথ্য সংগ্রহকরে ২রা এপ্রিল হাওড়া স্টেশন পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যা ৭টার অমৃতসর মেল ধরব বলে। ট্রেনে উঠে সবার কাগজপত্র একত্র করে দেখি বিস্তর যাকে বলে ইনফরমেশন গ্যাপ। পোখরা ট্যুরিস্ট অফিস থেকে কিছু কিছু নতুন খবর পাওয়া গেল বটে তাসত্ত্বেও যে সব ফাঁক ফোঁকর থেকে গেল সেগুলোই তো অজানা পথের রহস্য হয়ে আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকতেথাকল।

নেপাল হিমালয়ের যে সব ট্রেকিং ট আছে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প তাদের অন্যতম। অন্নপূর্ণা শিখর অভিযান শু হয় এখান থেকে। অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে অধরা রেখেছিল। এর পদতলে পৌঁছবার রাস্তা বহু কষ্টে খুঁজে বের করেন মরিস হারজগ। কাঠমান্ডু থেকে ডুমরে হয়ে একটা পায়ে চলা পথে অন্নপূর্ণাকে প্রায় প্রদক্ষিণ করে মুক্তিনাথ পৌঁছেছে। খুলদি, তাল, হুমদে মানাং ফেদি আর শেষে থারং লা পাশ হয়ে মুক্তিনাথ মানাং থেমেক অন্নপূর্ণা ১,২,৩,৪, গঙ্গাপূর্ণা এইসব শৃঙ্গ গুলোকে দেখা যাবে বাঁ দিকে। কিন্তু এই দিক দিয়ে অন্নপূর্ণা যাবার রাস্তানেই। রাস্তা আছে সুইখেত থেকে ভেতরে ঢুকে মোমীখোলাকে অনুসরণ করে। খোলা অর্থাৎ নদী। এই রাস্তা পৌঁছেছে একেবারে অন্নপূর্ণা শিখরের পদপ্রান্তে। এইখান থেকে ডানদিকে দেখা যাবে অন্নপূর্ণা আর তার সঙ্গিনীদের। আর গঙ্গাপূর্ণাকেও।

এই পথে প্রত্যেক বছর শয়ে শয়ে ট্যুরিস্ট আসে। নেপাল হিমালয়ের ট্রেকিং টে হাঁটলে নিজেকে ভারী আন্তর্জাতিক মনে হয়। পথের ধারে সরাইখানায় দিনের শেষে খাবার টেবিল ঘিরে যখন বসি মনে হয় আমি এই পৃথিবীর নাগরিক। আমার পাশে বসে আছে ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান, ইস্রায়েল, ফ্রান্স, কানাডা, ডেনমার্ক, সুইডেন, শ্রীলঙ্কার নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা বর্ণের সব পর্যটক। সুযোগ পেলেই নেপাল হিমালয়ে বেড়াতে আসার এই বিলাসিতাটুক আমরাও করতে পারি এই কারণে যে এই পথে বেড়ানটা তুলনামূলক ভাবে শস্তা নেপাল আসার গাড়িভাড়াটুকু বাদদিলে বাদবাকি খাওয়া থাকার যা খরচ হয় তার চেয়ে কম খরচে আর কোথাও ঘোরা যায়

কিনা আমার জানা নেই। ট্রেকিং-এর সারাটা পথ থাকার জায়গা পাওয়া যায় মাত্র ৫/৬ টাকায় বিনিময়ে পরমাশর্চ্য যে ১৪-১৫ হাজার উঁচুতেও আপনি পেয়ে যাবেন ডানলপ পিলোর গদি, লেপ কম্বল। খাবার খরচ নীচের দিকে ১০-১২ টাকা। ভাল ভাত সব্জী। যত ওপরে ওঠা যায় ততই অবশও দাম বাড়তে থাকে। খাদ্য তালিকায় আমাদের ডালভাত ছাড়াও বিদেশীদের রসনাতৃপ্তিরও যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। নরম গরম মৃদু কঠিন পানীয়ও অঢেল। কি কষ্ট করে যে দুর্গম পাহাড়ে এই সব সামগ্রী বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তা না দেখলে বোঝান যাবে না। কিছুদূর পর্যন্ত খচচর যেতে পারে-- আরও বেশী উচুতে মানুষের দৈহিক ক্ষমতাই একমাত্র মুশকিল আসান।

কলকাতা থেকে আমরা যে খবর নিয়ে এসেছিলাম পোখরা ট্যুরিস্ট অফিস থেকে পাওয়া খবর তার সঙ্গে যোগ করে যা জানা গেল তা মোটামুটি এই রকম। সুইখেত থেকে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাবার দুটোপথ। একটা পথ গেছে সুইখেত থেকে নওগন্ডা, চন্দ্রকোট, খাঙঙ হয়ে। আরেকটা গেছে পোথানা, লানদুক, নিউব্রিজ হয়ে। দুটো রাস্তা এসে মিলছে তাওলুঙে। তাওলুঙ থেকে ছমঙ, কুলদিখর, হিঙ্কা কেভ বাজার হয়ে সোজা অন্নপূর্ণার পদতলে। আমরা ঠিক করলাম আমরা যাব দ্বিতীয় পথটা ধরে ফিরব প্রথম পথটা দিয়ে।

৩ এপ্রিল অমৃতসর মেলে পাটনা পৌঁছে রক্সৌল, বীরগঞ্জ হয়ে বাসে পোখরা এলাম ৪ এপ্রিল ভোরে। ছিমছাম সুন্দর নেপালী শহর পোখরা। শহরের এক প্রান্তে বিশাল লেক। তাতে মচ্ছপুছারের ছায়া। মাছের লেজের মত আকৃতিবিশিষ্ট বলে এই গিরিশৃঙ্গটির এরকম নাম। পোখরা থেকে আর যে গিরিশৃঙ্গটি দেখা যায় তা হল অন্নপূর্ণাসাউথ। পোখরায় ৪ এপ্রিল আমাদের সারাটা দিন কাটল ট্যুরিস্ট অফিস থেকে তথ্য এবং ব্যাঙ্ক থেকে নেপালী মুদ্রাসংগ্রহের কাজে। ৫ এপ্রিল বাড়তি লাগেজ সব পোখরার হোটেলে রেখে পিঠে কস্যাক বেঁধে টচার্ট সঙ্গে নিয়ে আমরা রওনা দিলাম। আমাদের পদযাত্রা যেখান থেকে শু হবে সেউ সুইখেতের উদ্দেশ্যে। এ যাত্রায় আমরা বাড়াবাড়ি রকম আত্মবিশ্বাসী। সঙ্গে পোর্টার বা গাইড নেই। ঠিক চিনে চলে যাব এই ভরসায় বেরিয়ে পড়েছি। পোখরার সাইনিং হসপিটাল থেকে সুইখেত পর্যন্ত জিপে যাওয়া যায়। ঘন্টা দেড়েকের পথ ধূলিধূসরিত উঁচু নীচু পাথুরে পথে যাত্রী বোঝাই সেই জিপযাত্রা যা হল সে আর বলবার নয়। জিপ থেকে নেমে দেখে নিতে হল শরীরের কল - কব্জাগুলো সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা।

সুইখেতে যেখানে জিপ আমাদের নামিয়ে দিল তার তিন দিকে ঘিরে প্রাচীরের মত পাহাড়। এরই মধ্যে একটা প্রাচীরের মাথায় আজ আমাদের চড়তে হবে। রূট চার্টে দেখি জায়গাটার নাম ধাম্পুস। উচচতা ১৫৮০ মিটার।আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গাটার উচচতা ৮১১ মিটার। পুরোটাই প্রাণান্তকর চড়াই। ঘন্টা তিনেকের জিভ বের করে দেওয়া চড়াই চলে ক্যাম্পাসে পৌঁছে একটু জিরোবার অবকাশ পেলাম। হাতমুখ ধুয়ে ছোট দোকানেডাল - ভাত - ডিমভাজা দিয়ে চমৎকার দ্বিপ্রাহরিক আহারের পরে যদিও মনে হচ্ছিল পথের পাশে ঝাঁকালো গাছে নীচে ঝিঝিরে হাওয়ায় লম্বা একটা ঘুম লাগাই। কিন্তু সে হবার যো নেই। আজই আমাদের পোথানা পৌঁছতে হবে।তবে আজকের দিনের সবচেয়ে কঠিন চড়াইটা আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন পোথানা পর্যন্ত যেখানে আজ রাতটা আমরা থাকব সবটাই প্রায় সমতল পথ। ধাম্পুস বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। হাজার ছয়েক পরিবারের বাস। মিডল স্কুল এমনকি হাইস্কুল পর্যন্ত আছে। নেপালের এই সব রাস্তায় পথ চলতে প্রায় প্রতিটি গ্রামেই দেখেছি স্কুল আছে। ফুটফুটেখ্যাঁদা নাক, খুদে চোখের গোলগাল বাচ্চারা ব্যাগ কাঁধে উঁচু নীচু পথ ডিঙিয়ে পড়তে আসছে। পোথানা ছোট গ্রাম।পথের ধারে গোটা দুয়েক লজ। লজ বলতে কাঠের একতলা বা দোতলা বাড়ি। কয়েকটা ঘর। ঘরে ঘরে কোথাও মেঝেতে কোথাও নীচু নীচু বাঙ্কের মত কাঠের প্লাটফর্মে তোষক বা গদি পাতা। যে যার মত শুয়ে পড়। লজেই খাবার ব্যবস্থা। বাসনপত্র ঝকঝক করছে। অর্ডার দিলে গরম গরম তৈরী করে দেবে। বাসি পচার কোন প্রশ্নই নেই। জলের ব্যবস্থা অবশ্য যথেষ্ট নয়। ঐ দুর্গম পাহাড়ে এটুকু জলও যে পাওয়া যাচ্ছে তাতেই নেপাল সরকারকে ধন্যবাদ দিতেহবে।

৬ এপ্রিল ভোরে পোথানা ছাড়লাম আমরা। লজ ছাড়িয়ে একটা বাঁক ঘুরতে জঙ্গল টঙ্গল সব অদৃশ্য। আকাশের কোল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছেন দক্ষিণী অন্নপূর্ণা। সর্বাঙ্গে গলানো রূপো। একেবারে ঝলমল করছে। পাহাড়ী পথে চলতে চলতে বিশদ প্রাণান্তকর চড়াই বেয়ে উঠতে গিয়ে যখন প্রায় এক হাত জিভ বেরিয়ে যাবার যোগাড় মনে মনে হাজারবার বলছি এই শেষ পাহাড়ে আর কোন দিন নয় তখনই হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে যখন সামনে দেখি দিগন্ত জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বরফ ঢাকা শৃঙ্গের পর শৃঙ্গের সব পথকষ্ট নিমেষে উধাও হয়ে যায়। তাইতো সমতলে আপনডেরায় ফিরে গিয়ে আবার তোড় জোড় করতে থাকি অচেনা কোন পাহাড়ের দিকে। হাঁটা পথ চারিদিক শুনশান। এজঙ্গলে পথ হারালে আর উপায় নেই। আমাদেরও যে একটু ভয় ভয় করছিল না তা নয়। ঝুঁকিটা একটু বেশিই নেওয়া হয়ে গেছে সঙ্গে লোক না নিয়ে। পথে এক পোর্টারের মুখে শুনলাম দিন কয়েক আগে এই পথে এক জাপানী পর্যটক খুন হয়েছেন। এসব ঘটনা কিন্তু সচরাচর ঘটেনা। নিছক একলা বহু বিদেশিনী শুধুমাত্র এক পোর্টারের ওপরভরসা করে পথ পাড়ি দিচ্ছেন এ পথে এমন অনেকের দেখা পাওয়া যায়। আমরা অবশ্য নিরাপদেই তোলকা পৌঁছালাম জঙ্গলের গা ছমছমে রাস্তায় হাঁটাটা দাণ উপভোগ করতে করতে। পথ হারাইনি কারণ কোনও জায়গায় পথ দুভাগ হয়েছে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়েছি। কারও না কারও দেখা পাওয়া যাবেই নয় পর্যটক

নয় গাঁয়ের লোক।

তোলকা একটা ছোট গ্রাম। উচচতা ১৮০০ মিটার। পাহাড়ের আনাচে কানাচে ছড়ানো ছেটানো দু-চারটে বাড়ি গ্রামে ঢুকতেই ভ
ালুকের মত লোমওলা কালো ভয়ঙ্কর দর্শন কুকুরের পাল তেড়ে এসেছে। সঙ্গে পিলে চামকানো আওয়াজ। আমাদের তিনমূর্তিরই পা
গুলো অলিম্পিক দৌড়ের জন্য প্রস্তুত। বহু কষ্টে নিজেদের সংযত করলাম। জানি ছুটলেই ওরাও ছুটবে। তার পর কি হবে ঈশ্বর জানেন।
আমার আর মঞ্জুর ওরই মধ্যে কুকুর সম্বন্ধে যৎসামান্য হলেও অভিজ্ঞতা আছে। কৃষ্ণা তো বিশ্বের সব কুকুরকেই ভয়ঙ্কর নরখাদক বলে
জানে। কৃষ্ণাকে থামানোই মুশকিল। বিশেষ করে এবার আমরা উৎরাই পথে ছুটলে পড়ে যাবার আশঙ্কা। সারমেয়কুল অবশ্য গ্রামের
সীমানা পর্যন্তই এল। তারপর শত্রু বিতাড়নের বিজয় গর্বে লেজ নাড়তে নাড়তে যে যার মত ফিরে গেল। তোলকা থেকে লানদ্রুক
একেবারে পুরোটা উৎরাই। প্রায় ঘনটাখানেকের পথ উৎরাইতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। এবড়ো খেবড়ো পাথরের পথে কেবলই
পদস্খলনের ভয়। হাঁটুর নীচে ভয়ঙ্কর চাপ পড়ে । পা টাটায়। থেমে চারিদিক নিরীক্ষণ করার জো নেই। সোজা জুতোর দিকে নজর করে
নীচে নেমে নেমে যাও। যাক অবশেষে লানদ্রুক। অবনতির একেবারে শেষ ধাপে হাঁফ ছেড়ে দেখি সামনে প্রায় সমতল চাষের জমি। একপ
াশে বয়ে চলেছে মোদীখোলা মোদী খোলার ধার দিয়ে হেঁটে হেঁটে আর একটু পরেই আমরা পৌঁছে যাব নিউব্রিজ। আকাশে একনও
যথেষ্ট আলো আছে। জঙ্গলের ভয়, কুকুর, বিকট উৎরাই পেছনে পড়ে রইল। সামনে মোদীখোলার ধারে নিউব্রিজ লজে আজ রাতের
মত বিশ্রাম। চল চল চল উর্ধব গগনে বাজে মাদল মার্চিং সঙ গাইতে গাইতে আমরা পৌঁছে গেলাম। আমাদের রাতের আশ্রয়ে।
নিউব্রিজ নদীর ধারে একটা লজ। আর ব্রিজ পেরিয়ে একটু ওপরে আরো দুটো লজ পাশাপাশি। নীচের লজটা দেখে কেমন ভত্তি হল ন
া। ছন্ন ছাড়া চেহারা। লোকজনও নেই ওপরের লজদুটোয় দেখি বাইরে খোলা জায়গায় টেবিল পেতে বিদেশী পর্যটক জনা কয়েক বসে
আছে। ওরই একটাতে আমরা আশ্রয় নিলাম। নদীর কনকনে জলে ভালকরে হাতমুখ ধুয়ে গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে কাঠের বারান্দায়
বসে যখন গরম চায়ের চুমুক দিচ্ছি মঞ্জু বলে উঠল স্বর্গ কোথাও থাকে-- মৃদুস্বরে কৃষ্ণা বলল হামিন অস্ত হামিন অস্ত হামিন অস্ত। মোদী
খোলা এখানে দুদিকে খাড়া পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে একটা গর্জের সৃষ্টি করে বয়ে চলেছে। তার গর্জনে কান পাতা দায়। দূরে পাহাড়ের ম
াথায় সূর্যাস্তের গাঢ় লাল আভা একটু একটু করে ফিকে অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। একটি দুটি পাখী ডাকছে। নিচের লজের ছেলেরা পাথর
গেঁথে পাঁচিল তুলছে তাদের কলরব। পাশের লজের উঠোনে এক হাত ভাঙা সাহেব পড়ে আসা বিকেলের ম্লান আলোয় ঝুঁকে পড়ে ড
ায়েরী লিখছে। কোন সুদূর চুঁচুড়া শহরের মানুষ আমি। এই রকম একটা জায়গায় বসে আছি। কী যে আশর্চ্য অনুভূতি।

নীচের লজে এক বুড়ি থাকে। এ অঞ্চলের লোকেরা তাকে ডাইনী বলে সন্দেহ করে। রাত্রে খাবার টেবিলেচারিদিকের ছমছমে অন্ধকারের
মধ্যে ম্লান মোমবাতির আলো সামনে রেখে স্থানীয় একটি ছেলে ডাইনী বুড়ির ভয়ানক ভয়ানক সব গল্প বলছিল। স্বজনহীন অসহায় বৃদ্ধ
ার ওপর অত্যাচার করার ছুতো হিসাবে যে এসব কল্পকাহিনী ছড়ানো হয় তা জানা থাকা সত্ত্বেও ঐ পরিবেশে সব কিছুই বিশ্বাস্য
ঠেকছিল। এমন কি আমরা যে ঐ লজটায় থাকতেযাইনি তাই ভেবে মনে মনে স্বস্তিও বোধ করছিলাম। অন্ধকারে খাওয়া সেরে কাঠের
সিড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেবারে বারে পেছন ফিরে দেখার ইচছাটা কোনমতে দমন করেছিলাম।

৭ এপ্রিল। আজ আমরা যাব ছমঙ। এই পথের কষ্ট সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করে দিয়েছিলেন কলকাতার যুব কল্যাণ দপ্তরের
সুভাত রায়। তখন অত গুত্ব দিই নি। এ পথে এসে পড়ে হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। নিউব্রিজ লজ থেকে বেরিয়ে খানিকটা পথ মোদীখোল
া আমাদের সঙ্গে ছিল। মোদীখোলা যেই আমাদের পাশ থেকে অদৃশ্য হল অমনি সামনে চেয়ে দেখি খাড়া পাথরের দেওয়াল। একেব
ারে ন্যাড়া একটা পাহাড়। কৃষ্ণা আঙুল দিয়েদেখাল দেখুন কেমন পিঁপড়ের সারির মত উঠে যাচ্ছে। লাল নীল হলুদ রঙের সব পিঁপড়ে
মানুষ। তিনটি আইরিশছেলেও আমাদের মত হাঁ করে উর্ধবমুখী হয়ে ওদের দেখছিল। কি করব ফিরে যাবার তো ইচছা নেই। এখন এই
দেয়াল ভেদ করতেই হবে। তিনজনেই পরস্পর পরস্পরকে সাহস দিতে দিতে এগোই । এখান থেকে তাওলুঙ পর্যন্তউঠতে আমাদের
সময় লাগল প্রায় ৩ ঘন্টা । খাড়া পাথুরে দেওয়াল বেয়ে উঠে যাওয়া। মাঝে মাঝে সিঁড়ি করা থাকলেও বেশীর ভাগ পথটাই কাঁকুরে
মাটির। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছি আর মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছি। মঞ্জুর কথা বলারও শক্তি নেই ক্ষীণ দুর্বল চেহারা নিয়ে। ও
যে এতটা পথ পাড়ি দিচ্ছে তা দেখেই অন্য যাত্রীরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কৃষ্ণা তেড়ে অন্নপূর্ণাকে গালাগাল দিচ্ছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উঠতে পারলাম তো। আইরিশ ছেলেগুলো কখন আমাদের অনেক পেছনে ফেলে চলে গেছে। আমরা তিনটি ক্ষীণতম
সাহসিকা পরস্পরকে ধরে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে কখনও নিজেকে হেঁচড়ে টেনে হাতপা ছড়ে কেটে অবশেষে তাওলুঙ যখন পৌঁছলাম
তখন গভীর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সামনের ফুলভর্তি রডোডেনড্রন গাছটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলতে ইচেছ হল এসে গেছি। কৃষ্ণা শুয়ে
পড়েছে ফুলে ফুলে ভরা গাছটার নীচে পাথরভাঁধানো চাতালে। মঞ্জু ঢক ঢক করে জল খাচ্ছে। আমি ভাবছি তাওলুঙের এই রমে

াডেনড্রন গাছটা কি আমাদেরই অভ্যর্থনা জানবার জন্য হাত ভর্তি ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ? তাওলঙ থেকে ছমঙ পনের মিনিটের পথ। একেবারে সমতল। ছমঙ এপথের শেষ গ্রাম। বড় বড় সাজানো গোছান বেশ কয়েকটি লজ আছে এখানে। হোটেলই বলা যায়। এখানে বিদেশীদের জন্য চেকপোষ্ট আছে একটা। এখানকার ক্যাপ্টেনস্ লজেই আজকের মতো আমাদের বিশ্রাম। আমেরের সঙ্গে গল্পগুজব করে চমৎকার কাটল সন্ধেটা। আলাপ হল সিংহলী মেয়ে কৃশান্তি আর তার স্বামী ডেনমার্কের পিটারের সঙ্গে। কৃশান্তি বেচারীদের অবশ্য শেষ পর্যন্ত অন্নপূণা যাওয়া হয়নি। হাঁটুর যন্ত্রণা নিয়ে কৃশান্তি কষ্ট পাচ্ছিল। মাঝপথে পিটরের জুতোর তলাটা গেল খুলে। আরেক জোড়া সঙ্গে নেই। তাও দড়ি দিয়ে বেঁধে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিল সে। কিন্তু বউ - এর হাঁটুর ব্যথা বাড়ায় আর ঝুঁকি নিল না। আমাদের বিদায় জানিয়ে ফিরতি পথ ধরল। চলার পথে কতটুকুই বা পরিচয়। তবু মনটা খারাপ হয়ে গেল।

৮ এপ্রিল ছমঙ থেকে হিমালয়ান হোটেল আমাদের গন্তব্য। খুব বেশি চড়াই উৎরাই নেই। বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে জল কাদায় প্যাচ প্যাচে রাস্তা। অনেকগুলো ঝর্ণা পড়বে রাস্তায়। মাঝখানে কুলদিখর বলে একটা জায়গায় একটা হেলিপ্যাড দেখলাম। বাঁশবনের মধ্যে ডোম কানার মত পথও হারালাম বার কয়েক। তখনই দেখা হয়েছিল বব আর পূর্ণর সঙ্গে। বব আমেরিকান। কাজ করে থাইল্যাণ্ডে। পূর্ণ ওর পোর্টার । এখন থেকে পূর্ণ হয়ে গেল আমাদের গাইড। নারী জাতির প্রতি আমেরিকান পুষ ববের শিভালরিব সৌজন্যে।

হিমালয়ান হোটেল থেকে অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প পর্যন্ত পথে বরফ থাকে এই সময়টাতে। ঢুলু পাহাড়ের গায়ে জমা বরফে পা রাখাই মুসকিল। কেবলই পিছলে যায়। বিদেশীদের জুতো টুতোগুলো অন্যরকম। ওরা দিব্যি পেরিয়ে যাচ্ছে। আমাদের জুতোগুলো মজবুত হলেও ঠিক এই পথের উপযুক্ত নয়। আর আমরা তত এক্সপার্টও নই। হাঁচড় পাঁচড় করে পাহাড় চলি। বরফের রাজ্যে এসে পড়ে একেবারে নাস্তানাবুদ। পা পিছলে গেলে আর উপায় নেই। গড়াতে গড়াতে কোথায় গিয়ে যে পড়ব কে জানে। পূর্ণ হল আমাদের ত্রাণ কর্তা। কি ভাবে যে ও আমাদের বাগার পর্যন্ত পৌঁছে দিল সে আমরাই জানি।

৯ এপ্রিল বেশ বেলাবেলিই বাগারে পৌঁছলাম আমরা। আজকের মত যাত্রা বিরতি। কাল সকালে এখানেই তল্পি তল্পা রেখে আমরা বেসক্যাম্প ঘুরে আসব।
বাগারে পৌঁছেছি সকাল দশটা নাগাদ। কিন্তু দিন কি রাত বোঝা যাচ্ছে না। বাইরে শু হয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টি। গুম গুম করে ডিনামাইট ফাটানোর মত আওয়াজ আসছে অনবরত। এরকম আওয়াজে অভ্যস্ত নয় কান। ভয়ে আশংকায় আমাদের বুকের ভেতরেও প্রায় একই রকম আওয়াজ হচ্ছে। শুনলাম বরফের পাহাড়ে ধস নামছে। যেলজ লজটায় বসে আছি তা ভিড়ে ঠাসা। বেসক্যাম্প ফেরত বা বেসক্যাম্প যাত্রীর ভিড়। বলে দিল তোমরা একা যাবার চেষ্টা কোরনা। বিপদে পড়বে। আমাদের সঙ্গে যাবে। আমরা ভোর চারটে নাগাদ রওনা দেব। যত সকাল সকাল ঘুরে আসা যায় ততই ভাল। কারণ এগিতে বেলা বাড়লেই দুর্যোগ শু হয়। আমাদের মুখে রা-টি নেই। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছি। আর যারা ফিরছে তাদের কাছে পথের বর্ণনা শুনছি। এই সব ডাকাবুকো লোক। এমন সব পোষাক আশাক । তারাই যা অভিজ্ঞতার কথা বলছে শুনে আমাদের চক্ষু স্থির। আমাদের এই তো সব চেহারা। যৎসামান্য পোষাক। আমরা কি পারব শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে ? সন্ধ্যা নামার আগেই আপাদ মস্তক গরম জামা মায় জুতো শুদ্ধ পরে শুয়ে পড়েছি কম্বল চাপা দিয়ে। কানের মধ্যে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। পেট গুড় গুড় করছে। সারা শরীর দিয়েযেন পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। অত্যধিক উচচতা শরীরে নানা রকম প্রতিত্রিয়া ঘটাচ্ছে বুঝতে পারছি। রাতের কিছুই প্রায় খাওয়া গেলনা। ঘুমও হলনা। খালি টর্চ জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখছি। পথে বেরোলে এ দায়িত্বটা আমার ঘাড়েই চাপায় বন্ধুরা ভোর বেলা ডেকে দেবার। ডাকলে আবার তারাই গালাগাল দিতে থাকে। চারটেয় উঠে পড়লাম। আমরা তিনজন, বব আর পূর্ণ। জামা কাপড় পরাই আছে। শুধু মাথা আর কান ঢেকে নেওয়া। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় পথ চলেছি। পূর্ণর হাতে জোরাল টর্চ। সারি দিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। কারণ পথ সঙ্কীর্ণ খানিকটা হেঁটেই অবাক বিস্ময়ে সবাইথমকে দাঁড়াই। সামনে একি দেখছি ? রূপকথার দুধ সমুদ্র নাকি উত্তরমের বরফে ঢাকা প্রান্তর ? আমাদের তিন দিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফের শৃঙ্গ। শেষ রাতের কুমড়ো ফালি চাঁদ আটকে আছে অমনি এক শৃঙ্গের মাথায়। কে জানে পুরাণকারেরা এমনই কোন দৃশ্য দেখে মহাদেবের জটায় চাঁদ এঁকে দিয়েছিলেন কিনা। বব ছবি তুলছে। আমি ববকে আমাদের মহাদেবের কথা বলছি। কিন্তু সবটাই কেমন ঘোরের মধ্যে । এই প্রান্তরের শেষে আমাদের পৌঁছতে হবে। এতদূর থেকে এসেছি পথে এত কষ্ট করেছি ঐখানে অন্নপূর্ণার পদতলে পৌঁছব বলে। হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে বরফে। চোরা চড়াই আর তার সঙ্গে উচচতাজনিত উপসর্গ দম বন্ধ হয়ে আসছে। অন্ধকার কেটে সকাল হচ্ছে। সাদা পোলি আলোর রেখা এসে পড়ছে। ডানদিকে পড়ে থাকল মচছপুছারে বেস ক্যাম্পের পথ। আমি হাঁটছি। বব আর পুর্ণকে দেখতে পাচ্ছিনা। কৃষ্ণা আর মঞ্জুর সঙ্গেও দূরত্ব বাড়ছে। সামনে বরফের ওপর পায়ের ছাপ। ওরই ওপর পা ফেলে ফেলে যেতে হবে। এদিক ওদিক হলে বিপদ। রাস্তা হারিয়ে যাবে। কিন্তু আমি বোধ হয় আর পারব না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দুরে দেখতে পাচ্ছি বেসক্যাম্পের লাল - নীল তাঁবু। অনেক লোকের নড়াচাড়া। আমার সঙ্গীরা পৌঁছে গেছে। ওদের কাছে জল। আমি মঠোমুঠো বরফ কুড়িয়ে মুখে পুরছি

কিন্তু আমার তেষ্টা মিটছেনা। আমার পাশ কাটিয়ে ক্লান্ত পায়ে চলে যাচ্ছে একটি বিদেশী ছেলে। ইসারায় জল চাইলাম। সে তার কস্যাকে ঝোলান বোতল দেখিয়ে দিল। হাত তুলে নেবার ক্ষমতা নেই ঐ অবস্থাতেই কোন ক্রমে বোতল তুলে গলায় ঢাললাম। তারপর চুপ করে পথের পাশে একটা ন্যড়াপাথরে বসে রইলাম সঙ্গীদের অপেক্ষায়। ঐ তাঁবু আর মানুষের ভিড়ে আমি যাবনা। আমার শক্তি প্রায় নিঃশেষ। আমার সামনে অন্নপূর্ণা সাউথ। বাঁদিকে হিমচোলি, অন্নপূর্ণার ডান দিকে পর পর ফাং, অন্নপূর্ণা ৩, গ্লেসিয়ার ডোম, টেন্ট, পিক, গঙ্গাপূর্ণা, গেবল হর্ণ। ওর সব হিমশীতল দৃষ্টিতেআমার দিকে তাকিয়ে আছে। তর্জনী তুলে বলছে আর এগিয়ো না।